Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 110–115
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

কুষ্ঠরোগীর বউ : মহাশ্বেতার ব্যক্তিপরিচয় থেকে ব্যাষ্টির পরিচয়ে উত্তরণ

ড. রাকেশ জানা
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ
ইমেল : rakeshjana3010@gmail.com

Keyword
নিয়তির নির্মমতা, মানুষের অসহায়তা, নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্ক, নারী মনস্তত্ত্ব, নারী অবমাননা, বিদ্রোহ।

Abstract
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চারপাশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ে মানুষের আচরণ, বর্বরতা তথা প্রাগৈতিহাসিক স্তরে নেমে গেছে। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ও নারীর দখলদারীতে মানুষের লোভ ও যৌন রিরংসা নগ্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। পুঁজিপতিদের হিংস্র লোভে জনজীবন তখন ব্যতিব্যস্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছিলেন কিভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কিছু বিকৃত রুচিশীল মানুষ পৃথিবীর সমস্ত টাকা নিজেদের কাছে গচ্ছিত করে রেখেছে। ফলে তাদের এই পাপের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। তাদের এই ভন্ডামি ও অনাচারের দ্বারা ধনলুণ্ঠনের বিরুদ্ধে মর্মাহত, অক্ষম ও অসহায় মানুষের শুধুমাত্র অভিশাপ দেওয়া ছাড়া, করণীয় কিছু ছিল না। 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পে রয়েছে নিয়তির নির্মমতা ও মানুষের অসহায়তা, নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্ক, নারী মনস্তত্ত্ব– তাদের অবমাননা জনিত যন্ত্রণা ও অস্ফুট বিদ্রোহ। মানুষ অদৃষ্টের হাতে অসহায় পুতুল মাত্র, স্বাধীন ইচ্ছা বলে তার কিছুই নেই। কোন স্বাধীন ইচ্ছাই অন্ধ নিয়তি সফল হতে দেয় না। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র থেকে তাই তার নিস্তার নেই। পিতার অপকর্মের ফল তাই ভোগ করে সন্তান। পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাবে মানসিক অসুস্থতা তৈরি হয়। দাম্পত্য সম্পর্কে যেখানে স্বামীর লুব্ধ দৃষ্টি শুধুমাত্র স্ত্রীর দেহের মাংস, চর্ম ও বর্ণের প্রতি থাকে; সেখানে একাত্মতার নিবিড় বন্ধন ছিন্ন হতে বাধ্য। সেখানে স্ত্রী শুধুই শয্যাসঙ্গিনী হয়েই রয়ে যায়, অর্ধাঙ্গিনী হয় না। গল্পে অসুস্থ যতীনের সেবা করতে করতে মহাশ্বেতার চোখের ফাঁকা দৃষ্টি যে আজকাল শ্রান্তিতে স্তিমিত হয়ে গেছে সেটা যতীনের মনে হয় মহাশ্বেতার পরিতৃপ্তি; ওর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটাও যতীনের কাছে হয়ে উঠেছে সাজসজ্জা। সংকীর্ণ কারাগারে নিজের বিষাক্ত চিন্তার সঙ্গে দিন-রাত্রি আবদ্ধ থাকতে থাকতে যতীন দিনের পর দিন অমানুষ হয়ে উঠতে লাগল। এভাবে রোগগ্রস্ত স্বামীর কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করেও বিনিময়ে মহাশ্বেতার প্রাপ্তি অপমান, সন্দেহ ও কটুক্তি; তাই তার অবমাননা জনিত বেদনা তাকে বিদ্রোহী করেছে। তবে এ বিদ্রোহ অস্ফূট-দরদী প্রতিবাদ।

Discussion

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্য করেছিলেন চারপাশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়। তিনি অনুভব করেছিলেন ধনতন্ত্রের মৃত্যু না ঘটলে আদর্শ সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে না। এই সময় মানুষের আচরণ, বর্বরতা তথা প্রাগৈতিহাসিক স্তরে নেমে গেছে। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ও নারীর দখলদারীতে মানুষের লোভ ও যৌন রিরংসা নগ্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। পুঁজিপতিদের হিংস্র লোভে জনজীবন তখন ব্যতিব্যস্ত। তিনি দেখেছিলেন কিভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কিছু বিকৃত রুচিশীল মানুষ পৃথিবীর সমস্ত টাকা নিজেদের কাছে গচ্ছিত করে রেখেছে। ফলে তাদের এই পাপের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। তাদের এই ভন্ডামি ও অনাচারের দ্বারা ধনলুণ্ঠনের বিরুদ্ধে মর্মাহত, অক্ষম ও অসহায় মানুষের শুধুমাত্র অভিশাপ দেওয়া ছাড়া, করণীয় কিছু ছিল না। আলোচ্য 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পের সূচনায় মানিক তাইতো পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশক্রমটি দেখিয়ে বলেছেন-

> "একথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড় স্কেলে করতে পারার নাম বড়লোক হওয়া? কম ও বেশি অর্থোপার্জনের উপায় তাই একেবারে নির্ধারিত হইয়া আছে, কপালের ঘাম আর মস্তিস্কের শয়তানি। কারো ক্ষতি না করিয়া জগতে নিরীহ ও সাধারণ হইয়া বাঁচিতে চাও, কপালে পাঁচশো ফোঁটা ঘামের বিনিময়ে একটি মুদ্রা উপার্জন কর : সকলে পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ করিবে। কিন্তু বড়লোক যদি হইতে চাও মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ কর। তোমার জন্মগ্রহণের আগে পৃথিবীর সমস্ত টাকা মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দখল করিয়া আছে। ছলে বলে কৌশলে যে ভাবে পারো তাহাদের সিন্ধুক খালি করিয়া নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমাও। মানুষ পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিশাপ দিবে। ধনী হওয়ার এ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই।"[১]

আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগ। বাংলায় তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিদেশী দ্রব্য বয়কট চলছে। তাঁর বাল্যকালে প্রথম মহাযুদ্ধের অভিঘাত এদেশের মানুষের জীবনে ও মননে স্বরাষ্ট্র শাসনের আশা রোপণ করেছিল। কিন্তু ভুল ভাঙলো মহাযুদ্ধের অবসানে, মানুষের আশা ভরসার স্বপ্নভঙ্গ হল। শুরু হল সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনে প্রবল মানসিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও আর্থিক সংকট। যে সহজ বিশ্বাসবোধে মানুষ এতকাল নিজেকে রক্ষা করে এসেছিল তা আর সম্ভব হয়ে উঠছিল না। যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই পুঁজিপতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর শোষণ উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে উঠল। এই সংকটলগ্নেই কৈশোর ও যৌবন কেটেছে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের। মানিকের সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্ব শুরু হয়েছিল ১৯২৮ থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি 'গল্প লেখার গল্প'-এ এই কালপর্বের তাঁর চিত্তাবস্থার পরিচয় দিচ্ছেন-

> "কলেজ থেকে তখনকার কলিকা বালিগঞ্জের বাড়িতে ফিরতাম, আলোহীন পথহীন অসংস্কৃত জলার মতো লেকের ধারে গিয়ে বসতাম চেনা অচেনা কোন একটি প্রিয়ার মুখ স্মরণ করে একটু চলতি কাব্যরস উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে। ভেসে আসত নিজের বাড়ির আত্মীয় স্বজন আর পাড়াপড়শীর মুখ, জীবনের অকারণ জটিলতায় মুখের চামড়া যাদের কুঁচকে গিয়েছে। ভেসে আসত স্টেশনে ও ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারের মুখ তাদের আলাপ-আলোচনা। ভেসে আসত কলেজের সহপাঠীদের মুখ শিক্ষার খাঁচায় পোরা তারুন্য সিংহের সব শিশু, প্রাণশক্তির অপচয়ে যারা মশগুল। তারপর ভেসে আসত খালের ধারে, নদীর ধারে, বনের ধারে বসানো গ্রাম-চাষী, মাঝি, জেলে, তাঁতিদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ। লেকের জনহীন স্তব্ধতা ধ্বনিত হত ঝিঁঝির ডাকে, শেয়াল ডেকে পৃথিবীকে স্তব্ধতর করে দিত, আবার চোখ ঠারত আকাশের হাজার ট্যারা চোখের মতো, কোনদিন উঠত চাঁদ। আর ওই মুখগুলি মধ্যবিত্ত আর চাষাভুষো ওই মুখগুলি আমার মধ্যে মুখর অনুভূতি হয়ে হয়ে চ্যাঁচাতো ভাষা দাও-ভাষা দাও।"[২]

আলোচ্য 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পে রয়েছে নিয়তির নির্মমতা ও মানুষের অসহায়তা, নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্ক, নারী মনস্তত্ত্ব –তাদের অবমাননা জনিত যন্ত্রণা ও অস্ফুট বিদ্রোহ। মানুষ অদৃষ্টের হাতে অসহায় পুতুল মাত্র, স্বাধীন ইচ্ছা বলে তার কিছুই নেই। কোন স্বাধীন ইচ্ছাই অন্ধ নিয়তি সফল হতে দেয় না। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র থেকে তাই তার নিস্তার

নেই। কিন্তু গল্পের সূচনায় মানিক দেখিয়েছেন শুধু অদৃষ্ট নয়, যেমন কর্মের তেমন ফল ভোগও করতে হয়। পিতার অপকর্মের ফল ভোগ করে সন্তান। গল্পে মানিক বলেছেন-

> "যতীনের বাবা অনন্যোপায় হইয়াই অনেকগুলি মানুষের সর্বনাশ করিয়া কিছু টাকা করিয়াছিল। সকলের উপকার করিয়া টাকা করিবার উপায় থাকিলে এমন কাজ সে কখনও করিত না। তাই জীবনের আনাচে-কানাচে তাহার যে অভিশাপ ও ঈর্ষার বোঝা জমা হইয়াছিল সেজন্য তাহাকে সপূর্ণরূপে দায়ী করা চলে না। তবু সংসারে চিরকাল পুন্যের জয় এবং পাপের পরাজয় হইয়া থাকে এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন বাপের জমাকরা টাকাগুলি হাতে পাইয়া ভালো করিয়া ভোগ করিতে পারার আগেই মাত্র আটাশ বছর বয়সে যতীনের হাতে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাব ঘটিল।"[৩]

আলোচ্য গল্পে দেখা যায় আধুনিক জীবন-যন্ত্রণা, যাতে দাম্পত্যের মতো একান্ত পবিত্র ও ব্যক্তিগত সম্পর্কও পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শণ ও বিশ্বস্ততার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব মানসিক অসুস্থতা তৈরি করে। দাম্পত্য সম্পর্কে যেখানে স্বামীর লুব্ধ দৃষ্টি শুধুমাত্র স্ত্রীর দেহের মাংস, চর্ম ও বর্ণের প্রতি থাকে; সেখানে একাত্মতার নিবিড় বন্ধন ছিন্ন হতে বাধ্য। সেখানে স্ত্রী শুধুই শয্যাসঙ্গিনী হয়েই রয়ে যায়, অর্ধাঙ্গিনী হয় না। আলোচ্য গল্পে যতীন ও মহশ্বেতার চার বছরের দাম্পত্য জীবন অসুখের ছিল না। কিন্তু যতীনের কুষ্ঠরোগ দাম্পত্য সম্পর্কে ভাঙন ধরায়। যখন যতীনের দেহে কুষ্ঠরোগের আপাত লক্ষণ হিসেবে একটি ফুসকুড়ি দেখা দেয়, তখন মহাশ্বেতা একটু আয়োডিন লাগিয়ে, একটি চুম্বনের দ্বারা যতীনকে সারিয়ে তুলতে চেয়েছে। কিন্তু ডাক্তার রোগটি সনাক্ত করে সাবধানতা অবলম্বন করতে বললে, তাদের ঘুম উড়ে যায়। অত্মীয়-পর সবার জন্যে নির্জনবাসের সাবধানতা অবলম্বন করলেও যতীন স্ত্রীকে কখনো কাছ ছাড়া করেনি। যার ফলাফল স্বরূপ তাদের অসুস্থ মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তবে যতীনের রোগ যখন বাড়াবাড়ি হয় তখন তাদের মধ্যে সহযোগ রূপান্তরিত হয়। মানিক তাদের বর্তমান দাম্পত্য সম্পর্কটির অসাধারণ চিত্রকল্প রচনা করেছেন, তা সংক্ষেপে তুলে ধরলাম-

> "জীবনে তাহাদের একটি সমবেত গতি ছিল। জীবনের পথে পাশাপাশি চলিবার কতগুলি রীতি ছিল। সে গতিও এখন রূদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে সব রীতিও গেছে বদলাইয়া। পুরানো ভালোবাসা, পুরানো প্রীতি, পুরানো কৌতুক নতুন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইয়াছে। বিবাহের চার বছর পরে পরস্পরের সঙ্গে আবার তাহাদের একটি নবতর সম্পর্ক স্থাপন করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। যার নাম দাম্পত্যালাপ এবং যাহা নয়টির মধ্যে প্রায় সবগুলি উপভোগ্য রসে সমৃদ্ধ, দুটি পৃথক শয্যার মাঝে চিড় খাইয়া তাহা নিঃশব্দে মরিয়া গিয়াছে। দিবারাত্রির মধ্যে একটি চুম্বনও আজ আর পৃথিবীর কোথাও অবশিষ্ট নাই। চোখে চোখে যে ভাষায় তাহারা কথা বলিত সে ভাষা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। সবটুকু নয়। এখন চোখের দৃষ্টিতে একটি বিহ্বল শঙ্কিত প্রশ্ন তাহারা ফুটাইয়া তুলিতে পারে। চোখে চোখে চাহিয়া এখন তাহারা শুধু দেখিতে পায় একটা অবিশ্বাস্য অপ্রকাশিত বেদনা এই জিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়া আছে : এ কী হলো?"[৪]

একথা কে না জানে সঙ্গীহীন জীবন মানুষের মনে অস্বাভাবিকতা ও অসুস্থতা আনে। নিঃসঙ্গতা এমনই একটা রোগ, একসময় যে ছিল অত্যন্ত আপনজন; আজ তাকে মনে হতে পারে অচেনা, অজানা, অন্য কেউ। তখন এই একান্ত আপনজনকে আঘাত দিতেও সে কুণ্ঠাবোধ করে না। অনেক সময় শারিরীক বিকার মানসিক বিকারের কারণ হয়। সুস্থ স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত হওয়ার জ্বালা; নিষ্ঠুর নিয়তির প্রতি দোষারোপ ও কটুক্তি বর্ষণের দ্বারাও যতীন মানসিক শান্তি পায় না। পৃথিবীর সব সুস্থির ও স্বাভাবিক অবস্থা তার মনে ঘৃণার উদ্রেক ঘটায়। আলোচ্য গল্পে লেখক দেখিয়েছেন-

> "সংকীর্ণ কারাগারে নিজের বিষাক্ত চিন্তার সঙ্গে দিবারাত্রি আবদ্ধ থাকিয়া যতীন দিনের পর দিন অমানুষ হইয়া উঠিতে লাগিল। বীভৎস রোগটা তাহার না কমিয়া বাড়িয়া চলিল, তার সুশ্রী রমনীয় চেহারা কুৎসিত হইয়া গেল। বাইরের এই কদর্যতা তাহার ভিতরেও ছাপ মারিয়া দিল। তার সঙ্গে কয়েক ঘন্টা একত্র থাকাও মুহ্যমানা মহাশ্বেতার

পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। কোনঠাসা হিংস্র জন্তুর মতো উগ্র ভীতিকর ব্যবহারে মহাশ্বেতাকে সে সর্বদার জন্য সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে শুরু করিয়াছে। মহাশ্বেতার নির্বাক ও নির্বিকার আত্মসমর্পণকে সে অসাধারণ ঘৃণার অস্বাভাবিক প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। মানুষকে দিবার যতীনের আর কিছুই নাই। সে তাই মানুষের উপর রাগিয়াছে। সে স্বার্থপর হইতে শিখিয়াছে। ব্যথা পাইয়াছে বলিয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে সে কুণ্ঠিত নয়।"[৫]

মানিক এই অংশে রোগগ্রস্ত যতীনের মানসিক ও শারিরীক বিকৃতি ও পাগলপ্রায় দশার অসাধারণ চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন।

"মেজাজটা যতীনের একেবারেই বিগড়াইয়া গিয়াছে। মাথায় রক্ত চলাচলের মধ্যে তাহার কি গোল বাঁধিয়াছে বলা যায় না, চোখ দুটি মেজাজের সঙ্গে মানাইয়া দিবারাত্রি আরক্ত হইয়া আছে। গলার আওয়াজ তাহার চাপা ও কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুলগুলি অর্ধেকের বেশি উঠিয়া গিয়া পাতলা হইয়া আসিয়াছে। নাকের রংটা তাহার তামাটে হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মুখের ও দেহের মাংস দেখিলে মনে হয় কতকালের বাসি হইয়া ভিতর হইতে পচন ধরিয়া গাঁজিয়া উঠিয়াছে।"[৬]

আলোচ্য গল্পে যতীন কুষ্ঠ রোগের শিকার, তাই স্ত্রীর স্বাভাবিক নিস্পৃহ অবিচলিত ব্যবহার তার মনে সন্দেহের আবহ নির্মাণ করে। অবিশ্বাসের চোরাস্রোত যতীনকে সর্বদা তাড়া করে ফেরে। পৃথক শয্যায় শুয়ে থাকা স্ত্রীর উপর নজরদারী চালাতে, যতীন স্ত্রীর পাশে এসে শোয়। ফলে মহাশ্বেতা পৃথক ঘরে শোয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে যতীনের মনে সন্দেহ আরো বাড়তে থাকে। নিম্নে মহাশ্বেতার প্রতি যতীনের মানসিক অস্থিরতা ও উদ্বেগের চিত্রটি লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে চিত্রিত করেছেন-

"মহাশ্বেতার মুখের লালিমা তার চোখে রূপৈশ্বর্যের মতো লাগে, ওর চোখের ফাঁকা দৃষ্টি যে আজকাল শ্রান্তিতে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে সেটা তার মনে হয় পরিতৃপ্তি। ওর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা যতীনের কাছে হইয়া উঠিয়াছে সাজসজ্জা। তার দৃষ্টির আড়ালে ওর নেপথ্য জীবনটির পরিসর বাড়াইয়া তোলা যতীনের কাছে গভীর সন্দেহের ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাকে একা ফেলিয়া সমস্ত দুপুরটা সে কাটায় কোথায়? অন্য ঘরে বিশ্রাম করে? যতীন বিশ্বাস করে না। বিশ্রামের জন্য অন্য ঘরেরই যদি তার প্রয়োজন, যতীনের পাশের ঘরখানা কী দোষ করিয়াছে? নির্জন দুপুরে নিচের তলার কোনার একটা ঘর ছাড়া ওর বিশ্রাম করা হয় না, বাহির হইতে যে ঘরে সকলের অগোচরে মানুষ আসা যাওয়া করিতে পারে?"[৭]

স্বামীর রোগ মুক্তির ভাবনায় আচ্ছন্ন মহাশ্বেতা পতিব্রতার মতো স্বামীর সব আব্দার অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। পচনশীল রোগ যতীনের মনেও পচন ধরিয়েছে। যতীন অনুরোধ করলে একসময় যে মহাশ্বেতা তার হাতের কনুইয়ের নিচে টাকার মত চওড়া রক্তাক্ত উর্বর ক্ষতটিতে চুম্বন করতে পারতো; তাকেও যতীন সন্দেহের বশে বলে ফেলে–

"তুমি আমায় ঘেন্না করছ শ্বেতা?"[৮]

এভাবে রোগগ্রস্ত স্বামীর কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করেও বিনিময়ে মহাশ্বেতার প্রাপ্তি অপমান, সন্দেহ ও কটুক্তি; তাই তার অবমাননা জনিত বেদনা তাকে বিদ্রোহী করেছে। তবে এ বিদ্রোহ অস্ফূট- দরদী প্রতিবাদ।

"সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তার অবসন্ন শিথিল ভাবটাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। মনে হয়, আত্মরক্ষার ঘুমন্ত প্রবৃত্তিগুলি আর তাহার ঘুমাইয়া নাই। এবার সে একটু বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। চিরটাকাল সহমরণে যাইবে না।"[৯]

একটা সংকীর্ণ পরিবেশে অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা সেবা-পরায়ণ হয়ে পতিব্রতার ধর্ম ও দায়িত্বগুলো পালন করতে করতে ক্রমশঃ চেতনাহীন হয়ে পড়েছিল মহাশ্বেতা; জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল আশা ও আনন্দের রঙ। যে বৈশাখী সূর্যের

অম্লান কিরণ ভালোমানুষ পাঁচ মিনিটের বেশি সহ্য করতে পারে না, সেই তীব্র রোদের ঝাঁঝে যতীনের পাশে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে কাটায় মহাশ্বেতা; কোথাও উঠে যায় না। তবুও স্বামীর অবিশ্বাসের বিষ-জ্বালা সহ্য করতে হয় তাকে। কিন্তু যবে হিংস্র ক্রোধের বশে যতীন আঙুলের ক্ষতগুলি মহাশ্বেতার হাতে ঘসে তার বিকৃত মানসিক অবস্থার চরম পর্যায়ে পৌঁছায়; তখন থেকেই মহাশ্বেতা স্বামীর কাছে নিজের দূরত্ব বজায় রেখে এক ধরণের ঘৃণা, বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ ঘোষনা করেছে। মহাশ্বেতা এরপর দাম্পত্য সম্পর্ক তথা সংসার জীবনের বাইরে এসে বৃহত্তর জীবনের সাথে পরিচিত হয়। সে কুষ্ঠরোগীদের সেবিকায় রূপান্তরিত হয়। নিজের বাড়িতেই কুষ্ঠরোগীদের জন্য সেবাশ্রম খুলে, তাদের ভরণ-পোষণ ও সুচিকিৎসার ভার বহন করে। এভাবেই সে শ্বশুরগৃহের পিতৃপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্য করেছে। সামাজিক বৈষম্য ভুলে মহাশ্বেতার এই মানবিকত্বে উন্নিত হওয়া গল্পকার মানিকের এই জীবন বীক্ষা মার্ক্সবাদেরই চেতনার ফসল।

মানুষের আদিম দুটি প্রবৃত্তি– অর্থলোভ ও কামপ্রবৃত্তি বা মিথুনপ্রবৃত্তি। মানুষ উপরে যতই পরিশীলিত হওয়ার চেষ্টা করুক, তার মধ্যে কিন্তু আদিম সত্তার পাশব প্রবৃত্তিটির বিলুপ্তি হয় না। তার সুপ্ত জৈবিক প্রবৃত্তির উদ্দামতার উন্মোচন কোন এক অসহায় মুহূর্তে প্রকাশ পায়। মানুষের মনে অনেক রকম প্রবৃত্তি চাপা থাকে বলেই তা প্রকাশ্যে এলে মনে আতঙ্ক জাগে। আলোচ্য গল্পে যতীনের মধ্যে বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে এই প্রবৃত্তির বীজ রয়েছে। যা কুষ্ঠ রোগের থেকেও ভয়ঙ্কর। গল্পের সূচনাতে আমরা যতীনের পিতার বিপুল অর্থলোভের কথা জানতে পারি। আবার গল্পের শেষাংশে মহাশ্বেতা ও ডাক্তারের কথোপকথনে যতীনের মধ্যে এই গুপ্ত প্রবৃত্তির কথা প্রকাশ পেয়েছে-

> "কুষ্ঠ কি ভয়ানক রোগ ডাক্তারবাবু!' ডাক্তার তাহার বিপুল অভিজ্ঞতায় আবার অল্প একটু হাসিয়াছে : 'এরকম কত রোগ সংসারে আছে! মানুষকে একেবারে নষ্ট করে দেয়, বংশের রক্তধারার সঙ্গে পুরুষানুক্রমে মিশে থাকে এমন রোগ একটা নয়, মিসেস দত্ত'। বংশ পুরুষানুক্রম কে জানে ডাক্তার কতখানি টের পাইয়াছিল?"[১০]

আলোচ্য গল্পে লোক মানসিকতায় একই পেশায় বেশি পারিশ্রমিক নেওয়া চিকিৎসকের সম্মান ও মর্যাদা নির্ধারিত হওয়ার কথা শুনিয়েছেন লেখক। গল্পে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত যতীনকে তিনটে ডাক্তার দেখতে এসেছে- ষোল টাকা ভিজিটের ডাক্তার, বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার আর একশো টাকা ভিজিটের ডাক্তার। সকলেই একই রোগ নির্ণয় করেছে। কিন্তু প্রত্যেকের কথা বলার ধরণ ও রুগী বা তার আত্মীয়দের আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টাটি ভিন্ন। আলোচ্য অংশটিতে পণ্যের দর কষাকষির উপর তার গুণাগুণ নির্ভরশীল- এই পরিবর্তনশীল মানসিকতার পরিচয় দেয়। আসলে এই অসুস্থ সমাজ এক ধরণের পণ্যমোহবদ্ধতার শিকার; তাই অর্থের প্রাচুর্যের ভিত্তিতেই সমস্ত কিছুর মান নির্ধারণ করা হয়। লেখক দক্ষতার সাহায্যে সমাজ-মানসিকতার পরিবর্তনের বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চেতনায় স্থির মানিক জানতেন এই জনসমাজ ভাঙছে; পঙ্গু হচ্ছে। এর পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। এই জনসমাজকে পাল্টাতে হলে, নতুন চৈতন্য আনতে গেলে শ্রেণীগত লড়াই-এর প্রয়োজন। মানিক আলোচ্য 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পে বলেছেন–

> "এ জগতের সব কিছুই যখন ভঙ্গুর, মনুষ্যত্বের ভঙ্গুরতায় বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই।"[১১]

যতীনের মনুষ্যত্বহীনতায় তাই অবাক হওয়ার কিছু থাকে না; তার মতো সামন্ততান্ত্রিক ঘরানায় বড়ো হওয়া ব্যক্তির পক্ষে এই ব্যবহার স্বাভাবিক। পরোক্ষে উচ্চ বংশের অহমিকা ভেঙে কুষ্ঠরোগীদের মায়ের মত মমতা দিয়ে সেবা করার মহাশ্বেতার একাকী সংগ্রাম, স্বামীর প্রতি তার দরদী প্রতিবাদ ও জনকল্যানের ভাবনা, অর্থের সমবন্টনের প্রচেষ্টা- ব্যক্তিপরিচয়কে উপেক্ষা করে ব্যাষ্টির পরিচয়ে 'কুষ্ঠরোগীর বউ' রূপে পরিচিত হওয়া নব চৈতন্যের সঞ্চার করে। মানিক তাই বলেছেন-

"সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্তগুলিকে ভালবাসে। মহাশ্বেতা দেবী তো নয়? সে শুধু কুষ্ঠরোগীর বউ।"[১২]

আসলে মহাশ্বেতা স্বামীর কুষ্ঠরোগকে ঘৃণা করেনি, অক্লান্ত সেবা করেছে স্বামীর এই রোগের। কিন্তু ঘৃণা করেছে স্বামীর অবিশ্বাসকে। 'ছেলেখেকো রাক্ষসী', পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ইত্যাদি নানা অপবাদ ও কটূক্তিকে সে আমল দেয়নি। কিন্তু যেদিন হিংস্র ক্রোধের বশে যতীন মহাশ্বেতার আঙুলে নিজের ক্ষত জোরে ঘষে দেয়; সেদিন থেকেই যতীনের প্রতি সব সহানুভূতি শেষ হয়ে যায় মহাশ্বেতার। তাই যতীনের মারা যাওয়ার পর সে আর যতীনের বউ নয়; 'কুষ্ঠরোগীর বউ'।

তথ্যসূত্র :

১. মানিক বন্দোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রা:) লিমিটেড, কলকাতা, শ্রাবন ১৩৫৭, ৫ম সংস্করণ, মে, ২০১০, সংখ্যা ২২০০, পৃ. ৫৮
২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গল্প লেখার গল্প, লেখকের কথা, পৃ. ৪-৫
৩. মানিক বন্দোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রা:) লিমিটেড, পৃ. ৫৮
৪. তদেব, পৃ. ৬১
৫. তদেব, পৃ. ৬৩
৬. তদেব, পৃ. ৬৩
৭. তদেব, পৃ. ৬৫
৮. তদেব, পৃ. ৬২
৯. তদেব, পৃ. ৬৩
১০. তদেব, পৃ. ৬৮
১১. তদেব, পৃ. ৬৩
১২. তদেব, পৃ. ৬৯